



বীর শহীদ

মো: আতিকুর রহমান

জন্ম তারিখ: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০
শাহাদাতের তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ: বরিশাল
জেলা: বরিশাল

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : গ্রাফিক্স ডিজাইনার,
শাহাদাতের স্থান : যাত্রাবাড়ী থানার সামনে।

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

“ শহীদ হওয়াই যার আসল তামাশা,

কে হারায় তাকে বলো কে হারায় ”

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বরিশাল বিভাগের প্রত্যন্ত গ্রামে পরিবারের মুখ আলো জন্ম নিয়েছিলো এক শিশু। প্রথম সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পিতামাতার আনন্দ কে দ্যাখে। হৃদয়ঙ্গম পরিবারের প্রথম সন্তানের নাম রাখা হয়েছিলো আতিকুর রহমান। পিতামাতা অতি কষ্টে মানুষ করেছিলেন আতিকুরকে। প্রত্যন্ত গ্রামে মুয়াজ্জিনের চাকরি করতেন পিতা। সামান্য বেতন থেকেই অতি কষ্টে একবুক আশা নিয়ে ৩ সন্তানকে পড়াশোনা শিখায় পরিবারটি। সন্তান বড়ো হয়ে ভালো কিছু করবে আর বাবা মায়ের কষ্টের লাঘব হবে।

পিতামার কষ্ট ঠিকই লাঘব হয়েছিলো কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হতে দেয়নি হয়েনারা। আদোরের সন্তানের বুক বুলেটে বাঁঝরা করার মাধ্যমে পিতামার স্বপ্নগুলোকেও যেনো বাঁঝড়া করে দিয়েছে।

মানুষরূপী হয়েনাদের ছোঁবেই হাজারো পিতা-মাতার স্বপ্নগুলো চোখের পানি আর একবুক কষ্ট হয়ে হারিয়ে যায় অতল গহ্বরে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

হৃদয়ঙ্গম পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন আতিকুর রহমান। বয়স যখন ২৮ বছর তখন তিনি পরিবারিকভাবে আপন চাচাতো বোন মছিয়া বেগমকে বিয়ে করেন। জীবিকার তাগিদে পাড়ি জমান ঢাকা শহরে। সেখানে ক্রীকে নিয়ে ছোট্ট ১টা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন ও দৈনিক একটা পত্রিকার অফিসে গ্রাফিক্সের কাজ করে ছোট্ট সংসার পরিচালনা করতেন। এতোটা অভাব অনটনের মধ্যেও কখনো বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন করতে ভুলে যাননি। নিজের পরিবারের ভরনপোষণ ব্যয় করার সাথে সাথে গ্রামেও বাবা-মা কে নিয়মকরে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন। শহীদ আতিকুর রহমানের রয়েছে ১ টি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান।

পুত্র সন্তানের বয়স ৪.৫ বছর ও পুত্র সন্তানের বয়স ২.৫ বছর। যেহেতু পরিবারের ভরনপোষণের সম্পূর্ণ ভার ছিলো আতিকুরের উপর তাই তিনি শহীত হওয়ার পরে তার স্ত্রী মছিয়া বেগম খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। আতিকুর রহমানের স্ত্রী মছিয়া বেগমের বাবার বাড়ির পরিবারও আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। আতিকুর মারা যাওয়ার পরে আতিকুরের স্ত্রী আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে তেমন কোনো সহযোগিতা পাননি। তার উপর দারিদ্রতার কারণে আতিকুরের পিতামাতাও পুত্রবধু ও নাতী-নাতনীদে দায়িত্ব নিতে নারাজ।

শহীদ আতিকুরের স্ত্রী ও সন্তানেরা বর্তমানে শহীদের শ্মশানবাড়ীতে অবস্থান করছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ আতিকুর মোবাইল থেকে প্রতিদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিউজ দেখতো। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অসীম সাহসিকতা দেখে আতিকুরের ও ইচ্ছে হতো আন্দোলনে নামার। যদিও চাকরি পাওয়াটা তার বড়ো কোন উদ্দেশ্য ছিল না তবুও বছরের পর বছর সশ্রমিক সরকারের এমন অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাইতো স্ত্রীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে প্রায়ই আন্দোলনে যোগদান করতেন। আতিকুরের অফিস টাইম ছিল এক বেলা।

তাই সকালের সিনেট অফিস করে বাসায় না ফিরেই আন্দোলনে যোগদান করতেন। বাড়িতে বাবা মাকে ফোন দিও আন্দোলনের যোগদানের বিষয়ে বলতেন। আত্মীয়দেরও আন্দোলনের যোগদানের গুরুত্ব বোঝাতেন। সর্বশেষ ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতা যখন বিজয় মিছিল নিয়ে রাজপথে একত্র হয় ঠিক সেই সময় আতিকুর নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। ছাত্র-জনতার সাথে যাত্রাবাড়ী থানা ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন। বিজয় মিছিলে উল্লাসরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতার কল্পনায়ও ছিলোনা যে এত বড় বিপ্লবের পরেও সশ্রমিক সরকারের পদলেহনকারী পশুপুলিশ বাহিনী মিছিলে অতর্কিত হামলা চালাতে পারে বা গুলি করতে পারে। বিজয় উল্লাসরত নিরস্ত্র ছাত্রজনতা ও শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে ঠেলে দিয়ে অতি উৎসাহী পথদ্রষ্ট পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। মহুঁর্তেই বিজয় মিছিল আর্চিটেকচারে রূপ নেয়। যাত্রাবাড়ী এলাকাটি ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। আতিকুর রহমানের মাথায় ঘাতকের একটি বুলেট কপালের ঠিক মাঝ বরাবর এসে লাগে। বুলেটের আঘাতে আতিকুরের মাথার খুলি উড়ে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে জমির রঙে লাল হয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই আতিকুর ঘটনাস্থানের শহীদ হন। আতিকুরের মোবাইল থেকে কল দিয়ে তার স্ত্রীকে ঘটনার কথা জানালে তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়েন। আতিকুরের স্বাধীনতার মরদেহ হাসপাতালে নিলে ডাক্তার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনে রাজপথে শহীদ আতিকুর রহমানের মরদেহ নিয়ে তার সাথীরা গ্রামের বাড়িতে রওনা দিন। বৃদ্ধ বাবা মা আতিকুরের মরদেহ বারবার মূর্ছা যান। রক্তে ভেজা দেহ দেখে আতিকুরের স্ত্রী পাগলপ্রায়। এলাকার মানুষদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জানাজা শেষ করে গ্রামের কবরস্থানে আতিকুরকে কবরস্থ করা হয়।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণঃ

পিতা: আতিকুর ছিল আমার প্রথম সন্তান। ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও নামাজে ছিলো। বেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত যতদিন বাড়িতে ছিলো সব সময় আমার সাথে নামাজ পড়তে যেতো। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ যে কতটা ভারী তা সন্তানহারা পিতা ছাড়া আর কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না। স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঢাকাতে বসবাস করলেও প্রতিদিনই আমাদের খোঁজখবর নিত।

শহীদের মাঃযে সন্তানকে জন্মদানের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মা হয়েছি তার স্মৃতিগুলো ভুলবো কি করে। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তবুও সন্তান হারানোর ব্যথা ভুলতে পারিনি। সন্তান হলে ব্যথা প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়ায়। আমার সন্তান পিতা-মাতার হক আদায় তুই কি করেনি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়াল্লা যেনো আমার কলিজার টুকরো সন্তানকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মাকাম দান করেন এই দোয়া করি।

শহীদের স্ত্রী: পাঁচ বছর চলছিলো আমাদের বিয়ের বয়স এরমধ্যে এমন একদিনও ছিল না যে আমার হাসবেশ আমাকে অসম্মান করেছে বা তারসাথে কোনো বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে। চমৎকার দাম্পত্য জীবন ছিলো আমাদের। আমার বাবা নেই, অনেক বছর আগে মারা গেছেন। বাবাকে হারানোর পরে আমার জীবনসঙ্গীকেই পেয়েছিলাম অভিভাবক হিসেবে। স্বামী ব্যতীত ছোটো-ছোটো দুটি সন্তান নিয়ে একটা মেয়ে কিভাবে পথ চলতে পারে? আমার চোখের পানি আর মনের ব্যথা কোনোটিই শেষ হয়নি। মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এ ব্যথা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার চার বছর ও দু বছরের দুটি সন্তান আছে। মৃত্যু কি জিনিস তা ওরা বোঝেনা। বাবা কখন ফিরবে এই প্রশ্নটি বারবার করতে থাকে, তখন আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকেনা। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখি। কি করবো কিভাবে আমার হাসবেশের রেখে যাওয়া সন্তানদের দায়িত্ব পালন করবো তা বুঝে আসেনা। তাকে নিয়ে কতোশতো স্মৃতি তা কিভাবে বলবো। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়াল্লা আমাকে অতি উত্তম জীবনসঙ্গী দান করেছিলেন কিন্তু তার সাথে কাটানোর মতো অতি অল্প সময় দিয়েছেন। আমাদের সমাজে একজন বিধবা মহিলা যে কতোটা অবহেলার স্বীকার হন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধু এইটুকু বলবো যে প্রকৃত অপরাধীর সঠিক বিচার হোক। আর কোনো মেয়েকে যেনো এভাবে বিধবা হতে না হয়।

শহীদের ফুপু: আমার ভাতিজা খুবই ভালো ছেলে ছিলো। আমাদেরকে খুব ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। সবসময় ফোন দিয়ে খোঁজ-কবর রাখতো।

শহীদের ফুপা মো: ইসহাকের মন্তব্য: প্রতিদিন সে আমাদের খোঁজখবর নিতো। এ কবার করে কল দিতো। আমাকে সাবধানে চলার পরামর্শ দিতো। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়াল্লা তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন।

বন্ধু: আতিক খুবই ভালো ছেলে ছিলো। বন্ধু মহলে ও অতি বিনয়ী ও জ্ঞানী মানুষ ছিলো। উত্তম পরামর্শ দিতো। যোকোনো ধরনের বিপদে/স্বাক্ষিপূর্ণ কাজে আতিকের মাথা খেকে চট করে বুদ্ধি বের হতো।

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক/একাধিক প্রস্তাবনা:

১। শহীদের স্ত্রীকে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়

২। বাসস্থানের প্রয়োজন

৩। শহীদের সন্তানদের ভরনপোষণের ব্যবস্থা করা।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পুরো নাম : মো: আতিকুর রহমান

জন্মতারিখ : ১৮/০২/১৯৯০

পেশা : গ্রাফিক্স ডিজাইনার

ঠিকানা : গ্রাম: ঘুন্সাবামা, ইউনিয়ন: বরজালিয়া, থানা: হিজলা, জেলা: বরিশাল

পিতার নাম : মো: নাসির উদ্দীন, বয়স: ৬২, পেশা: গ্রামের মসজিদের মোয়াজ্জিন

মাতার নাম : নুরজাহার বেগম, বয়স: ৫০, পেশা: গৃহিনী

ঘটনাস্থান : যাত্রাবাড়ী থানার সামনে

আক্রমণকারী : পুলিশ

শহীদ হওয়ার সময় ও তারিখ : ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ২.৩০টা

মৃত্যুর সময় ও তারিখ : ০৫/০৮/২০২৪

শহীদের কবরের অবস্থান : হিজলা উপজেলার বড়জালিয়া ঘোনের হাট দেওয়ান বাড়ি কবরস্থান

পবিত্র কুরআনের বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। (সূরা তাওবা ৯:১১১)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

